আষাঢ় আলো

ইসরাত আনিকা

লন্ডনের শীতল বিকেলটা জানালার ওপাশে ধূসর হয়ে ছিল, কিন্তু রায়ানের মনটা অদ্ভুতভাবে অস্থির।

পাঁচ বছর হয়ে গেছে সে বাড়ি ছাড়ার পর। পড়াশোনা, পার্টটাইম কাজ, নিজের মতো জীবন—সবই ঠিক ছিল। তবু মাঝেমাঝে রাতের বেলা হঠাৎ মনে হতো, কোথাও যেন কিছু ফেলে এসেছে।

সেই “কিছু”টা জায়গা না, মানুষ।

মা ভিডিও কলে বলেছিলেন,
— “এইবার আর না করে পারবি না। তোর মামাতো ভাইয়ের বিয়ে, সবাই আসবে। তুই না এলে কেমন লাগে বল?”

রায়ান হেসেছিল, কিন্তু বুকের ভেতর কেমন যেন ধক করে উঠেছিল।

কারণ ওই বাড়িতে আছে মেহর।

তার চাচাতো বোন। ছোটবেলার খেলার সঙ্গী।
শেষবার যখন দেখেছিল, মেহর ছিল বকবক করা এক স্কুলছাত্রী। এখন নিশ্চয়ই বদলে গেছে।

✈

ঢাকায় নেমেই গরম বাতাস যেন তাকে জড়িয়ে ধরল। গাড়িতে বসে গ্রামমুখী রাস্তায় যেতে যেতে তার চোখে পুরনো দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছিল।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই একসাথে কতগুলো গলা—

— “রায়ান আসছে!”
— “বিদেশ ফেরত ভাইয়া!”

— “এইদিকে এইদিকে!”

হাসি, কোলাহল, আত্মীয়স্বজন, ছোটরা দৌড়ে আসছে —সবকিছু মিলে বাড়িটা যেন জীবন্ত।

মা জড়িয়ে ধরলেন। বাবা কাঁধ চাপড়ে দিলেন। খালামণি, ফুফু, চাচা—সবাই একসাথে কথা বলছে।

এই ভিড়ের মাঝেই হঠাৎ কারও সাথে চোখাচোখি হলো।

বারান্দার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটা মেয়ে। হালকা নীল সালোয়ার, চুল খোলা, মুখে শান্ত একটা ভাব।

রায়ান কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েই রইল।

মেয়েটা মুচকি হেসে বলল,
— “চিনতে পারছো না নাকি, বিদেশি সাহেব?”

রায়ানের মাথায় যেন শব্দটা ধাক্কা দিল।

মেহর।

কিন্তু এই মেহর তো তার স্মৃতির সেই চঞ্চল মেয়েটা না।
এই মেহর শান্ত। চোখে গভীরতা। হাসিতে লাজুক উষ্ণতা।

— “তুই... এত বড় কবে হইলি?”
— “তুমি না থাকলে মানুষ বড় হয়েই যায়।”

ওরা দুজনেই হেসে ফেলল।
কিন্তু সেই হাসির ভেতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি ঢুকে গেল—
যেন তারা হঠাৎ করে নতুন করে একে অপরকে আবিষ্কার করছে।

দূর থেকে আরেকটা গলা এল—
— “রায়ান ভাইয়া!”

দৌড়ে এসে তার হাতে ঝুলে পড়ল তৃষা। খালাতো বোন। ছোটবেলা থেকেই ও রায়ানকে অসম্ভব পছন্দ করে—এটা সবাই জানে।

— “এইবার কিন্তু পালাতে পারবা না। আমি সারাক্ষণ তোমার পাশেই থাকবো!”

মেহর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
হালকা হাসি দিল, কিন্তু চোখের ভেতরটায় কিছু যেন নিভে গেল।

রায়ান সেটা খেয়ালই করল না।

সে তখনও বুঝতে পারেনি—
এই বাড়িতে ফিরে আসা শুধু একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া না।বাড়িটা যেন বিয়ের আগাম কোলাহলে শ্বাস নিচ্ছিল।

আঙিনায় ত্রিপল টাঙানো হচ্ছে, রান্নাঘরের পাশে বড় বড় হাঁড়ি ধোয়া হচ্ছে, ছোটরা দৌড়াদৌড়ি করছে। আত্মীয়স্বজনের হাসির শব্দে বাড়ির পুরনো দেওয়ালগুলোও যেন নতুন হয়ে উঠেছে।

রায়ান সবার মাঝখানে বসে আছে, কিন্তু তার মন বারবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।

বারান্দার এক কোণায় মেহর দাঁড়িয়ে খালামণিকে সাহায্য করছে। চুলটা আজ বাঁধা, কপালে ছোট টিপ। কথা বলছে কম, হাসছে নরমভাবে।

এই মেহরকে সে চেনে না।

ছোটবেলার সেই ঝগড়াটে, হাসিখুশি মেয়েটা কবে এমন শান্ত হয়ে গেল?

— “রায়ান ভাইয়া, এইটা ধরো না!”
তৃষা আবার এসে তার পাশে বসে পড়ল।

— “তুমি আসছো বলেই কিন্তু আমি নতুন ড্রেস বানাইছি।”

রায়ান হেসে বলল,
— “ওহ, তাই নাকি? দেখি তো কেমন হয়েছে।”

তৃষা খিলখিল করে হেসে তার হাত ধরল।
দূর থেকে মেহর তাকিয়ে ছিল।
তার ঠোঁটে হাসি ছিল, কিন্তু আঙুলের ফাঁকে ধরা ওড়নাটা অজান্তেই কুঁচকে যাচ্ছিল।

রায়ান খেয়ালই করল না।

তার চোখে তৃষা এখনও ছোটবেলার সেই আদুরে কাজিন।
কিন্তু মেহরের চোখে দৃশ্যটা অন্যরকম লাগছিল।

বিকেলে ছাদে হালকা বাতাস বইছিল। রায়ান একা দাঁড়িয়ে ছিল, গ্রামের আকাশের দিকে তাকিয়ে।

— “বিদেশে আকাশ কি আলাদা?”

পেছন থেকে মেহরের গলা।

রায়ান ঘুরে তাকাল।
— “না... আকাশ একি। মানুষ বদলায়।”

মেহর হালকা হেসে বলল,
— “সবাই বদলায় না।”

কথাটা খুব সাধারণ, কিন্তু কেমন যেন গভীর লাগল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ।

— “তুই খুব চুপচাপ হইয়া গেছিস,” রায়ান বলল।
— “সবাই তো বড় হইলে চুপ হইয়া যায়।”
— “আমারে দেখে খুশি হইছিস?”

মেহর একটু তাকিয়ে, তারপর চোখ নামিয়ে বলল,
— “জানি না... অনেকদিন পর দেখলে মানুষকে নতুন লাগে।”

রায়ানের বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা অনুভূতি উঠল। কিন্তু সে সেটার নাম জানে না। জানার চেষ্টাও করল না।

ঠিক তখন নিচ থেকে তৃষার চিৎকার—
— “রায়ান ভাইয়া! তুমি কোথায়? ছবি তুলবো!”

মেহর নিজেই বলল,
— “যাও, তোমারে ডাকতেছে।”

রায়ান নেমে গেল।
মেহর ছাদে দাঁড়িয়ে রইল।

আকাশটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে আসছিল।
তার মনে হচ্ছিল—

রায়ান ফিরে এসেছে, কিন্তু তাদের মাঝখানে অদৃশ্য একটা দূরত্বও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।বাড়িতে আজ আলোর মালা টাঙানো হচ্ছে। উঠোনজুড়ে ব্যস্ততা, হাসি, ডেকোরেশনের শব্দ।

কিন্তু এই ভিড়ের মাঝেও কিছু কিছু মুহূর্ত আলাদা হয়ে যায়।

মেহর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হাতে ট্রে। হঠাৎ পেছন থেকে রায়ানের গলা—

— “এই, তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস নাকি?”

মেহর থামল, কিন্তু ঘুরল না।
— “সবাই তো ব্যস্ত। এড়ানোর সময় কই?”

রায়ান কাছে এসে ট্রেটা নিয়ে বলল,
— “আগে তো আমার সাথে ঝগড়া না করলে তোর দিন শেষ হতো না।”

মেহর এবার তাকাল। চোখ শান্ত, কিন্তু ভেতরে ঢেউ।
— “মানুষ বড় হলে ঝগড়ার বিষয় বদলায়।”

— “আর আমরা?”
— “আমরাও বদলাই।”

কথাগুলো খুব স্বাভাবিক, কিন্তু দুজনের মাঝখানে বাতাসটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

বিকেলে কাজের ফাঁকে হালকা বৃষ্টি নামল। সবাই দৌড়ে কাপড় তুলছে। মেহর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

রায়ান এসে পাশে দাঁড়াল।

— “তুই আগের মতো হাসিস না কেন?”
মেহর হালকা হেসে বলল,
— “সব হাসি শব্দ করে না।”

রায়ান চুপ। এই মেহরকে সে বুঝতে পারছে না।

— “বিদেশে থাকলে কি মানুষ নিজের মানুষদের ভুলে যায়?” মেহর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

— “ভুলে যাই না... শুধু মনে করার সময় পাই না।”

মেহর তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।
— “সময় না পাওয়া আর কাউকে সময় না দেওয়া — এক জিনিস না।”

কথাটা নরম, কিন্তু আঘাতের মতো লাগল।

নিচে তৃষা হাসতে হাসতে সবার সাথে সেলফি তুলছে। হঠাৎ দৌড়ে এসে রায়ানের পাশে দাঁড়াল।

— “ভাইয়া, আমার সাথে একটা রিল বানাও না!”

রায়ান হেসে রাজি হলো। তৃষা তার হাত ধরে টান দিল।

মেহর সরে দাঁড়াল।

রায়ান খেয়াল করল না, কিন্তু মেহরের চোখের কোণে অদ্ভুত নীরবতা জমল।

সে ধীরে বলল, নিজের মনেই—
“কিছু মানুষ কখনো দূরে যায় না... তারা শুধু অন্য কারও কাছে চলে যায়।”

বৃষ্টি থেমে গেছে।
কিন্তু ভেতরের আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে।
রাতের খাওয়ার টেবিল মানেই বিশৃঙ্খলা।

লম্বা টেবিলে একসাথে বসেছে সবাই। বড় হাঁড়ি থেকে পোলাও উঠছে, কেউ গরুর মাংস চাইছে, কেউ সালাদ বাড়াচ্ছে।

শারমিন আক্তার বললেন,
— “রায়ান, ওখানে বসে আছিস কেন? মেহরের পাশে বস।”

রায়ান একটু থমকাল। মেহর মাথা নিচু করে ভাত মাখছে।

তৃষা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,
— “খালামণি, রায়ান ভাইয়া এখানে বসলে আমার সাথে কথা বলতে পারবে।”

সেলিনা খালা হেসে বললেন,
— “আরে ওদের ছোটবেলা থেকেই ভাব, একসাথে থাকুক না।”

টেবিলের নিচে মেহরের হাত থেমে গেল।

রায়ান হালকা হাসল, বিষয়টা এড়িয়ে গেল।
কিন্তু প্রথমবার সে অদ্ভুত অস্বস্তি টের পেল।

হুমায়ুন চাচা হঠাৎ বললেন,
— “রায়ান, বিদেশে থাকিস, কিন্তু নিজের মানুষদের ভুলিস না বাবা।”

রায়ান তাকাল।
তার চোখ হঠাৎ মেহরের চোখে আটকালো।

মেহর ধীরে বলল,
— “সবাই ভুলে না... কেউ কেউ শুধু দেরি করে মনে করে।”

টেবিলের কথাবার্তা চলতেই থাকল।
কিন্তু ওই এক লাইনে রায়ানের ভেতরে কোথাও শব্দ হলো।

সে বুঝতে পারছে না কেন,
কিন্তু আজ প্রথমবার মনে হলো—

এই বাড়িতে এমন কিছু আছে, যেটা সে হারাতে চায় না।সকালে বাড়ি ভরে গেল আত্মীয়দের শব্দে।

নাদিয়া আপুর গায়ে হলুদের প্রস্তুতি চলছে। উঠোনে চেয়ার সাজানো, হলুদের বাটি, ফুলের গন্ধ — চারদিকে উৎসবের রং।

রায়ান বারান্দা দিয়ে নামতেই সেলিনা খালার গলা—
— “আহা, আমাদের বিদেশি ছেলে নামছে! তৃষা, দেখ তো কে এসেছে!”

তৃষা দৌড়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।
আজ সে খুব সাজগোজ করেছে। চোখে কাজল, চুলে ফুল।

— “ভাইয়া, আজ কিন্তু তুমি আমার পাশে বসবা, ঠিক আছে?”

রায়ান হেসে বলল,
— “এত অর্ডার দিস কেন রে?”

দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল মেহর।

তার হাতে হলুদের বাটি, কিন্তু সে খেয়ালই করছে না হলুদ গড়িয়ে ওড়নায় লেগে যাচ্ছে।

রুবিনা চাচি ধমক দিয়ে বললেন,
— “মেহর! মন কই তোর?”

মেহর চমকে উঠল।
— “জানি না চাচি... মানে... দিচ্ছি।”

হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। সবাই মিলে নাদিয়া আপুর গালে হলুদ মাখাচ্ছে, হাসাহাসি, ছবি তোলা।

তৃষা জোর করে রায়ানের হাত ধরে বলল,
— “চলো, আমরা একসাথে দেই।”

রায়ান আপত্তি করল না।
ওরা দুজন একসাথে হলুদ মাখাল।

চারপাশে হইচই।

কিন্তু মেহরের চোখে দৃশ্যটা অন্যরকম।

হুমায়ুন চাচা মেহরের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন,
— “কী হইছে মা? শরীর খারাপ?”

মেহর মাথা নাড়ল।
— “না আব্বু।”

— “তোর হাসিটা কই গেল?”

মেহর হালকা হাসার চেষ্টা করল।
— “সব হাসি দেখানো যায় না।”

হুমায়ুন চাচা বুঝলেন না, কিন্তু মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন।

বিকেলে বাড়ির পেছনের আমগাছের নিচে একা বসেছিল মেহর।

রায়ান খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এল।
— “এই যে, সবাই তোকে খুঁজতেছে।”

— “আমারে খুঁজার মানুষ তো অনেক,” মেহর শান্ত গলায় বলল, “কিন্তু কেউ কি আসলে খেয়াল করে?”

রায়ান থেমে গেল।
— “এইসব কথা কইতেছিস কেন?”

মেহর মাটির দিকে তাকিয়ে বলল,
— “বিদেশে থাকতে থাকতে কি মানুষ বুঝতে ভুলে যায়, কে তাকে চুপচাপ দেখে রাখে?”

কথাটা হালকা, কিন্তু সরাসরি বুকের ভেতর ঢুকে গেল।

রায়ান কিছু বলতে পারল না।

তার ভেতরে প্রথমবার একটা তুলনা জন্ম নিল—
তৃষার উচ্চস্বরে উপস্থিতি,
আর মেহরের নীরব থাকা সত্ত্বেও গভীরভাবে পাশে থাকা।

সে বুঝতে পারছে না কেন,
কিন্তু আজ মেহরকে একা বসে থাকতে দেখে তার অদ্ভুত খারাপ লাগছে।

দূর থেকে তৃষার গলা—
— “রায়ান ভাইয়া! ফ্যামিলি গ্রুপ ফটো!”

রায়ান দাঁড়িয়ে গেল।
মেহর বলল,
— “যাও। তোমারে ডাকতেছে।”

রায়ান কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—
— “তুই না গেলে ছবি অসম্পূর্ণ লাগবে।”

মেহর তাকাল।
চোখে বিস্ময়, নরম আলো।

কিন্তু সে শুধু বলল—
— “সব ছবিতে সবাই থাকে না, রায়ান।”

কথাটা রায়ানের মাথায় রয়ে গেল।

সে চলে গেল,
আর মেহর আমগাছের ছায়ায় বসে রইল—
নিজের জায়গাটা ঠিক কোথায়, সেটা বোঝার চেষ্টা করতে করতে।ফ্যামিলি ছবির ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

নাদিয়া আপু মাঝখানে, দুপাশে কাজিনরা। তৃষা ইচ্ছে করে রায়ানের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তার হাত প্রায় রায়ানের কনুই ছুঁয়ে।

ফটোগ্রাফার বলল,
— “সবাই হাসেন!”

সবাই হাসল।

শুধু দুজনের হাসি একরকম না।

মেহর দাঁড়িয়ে ছিল একদম পাশে, কিন্তু ফ্রেমের প্রান্তে।
রায়ানের চোখ হঠাৎ তার দিকে গেল।

মেহর জোর করে হাসছে।
চোখ দুটো হাসছে না।

ক্লিক।

ছবি তোলা হয়ে গেল।
কিন্তু মুহূর্তটা কোথাও আটকে রইল।

🌙

রাতে ছাদে হালকা বাতাস। দূরে বিয়ের বাড়ির আলো, গানের শব্দ ভেসে আসছে।

রায়ান একা দাঁড়িয়ে ছিল। ফোন হাতে, কিন্তু স্ক্রিনে তাকানো নেই।

পেছন থেকে মেহর এলো।
— “ঘুমাও নাই?”

— “ঘুম আসতেছে না।”
— “বিদেশে থাকলে কি রাত ছোট লাগে?”

রায়ান হেসে বলল,
— “না... কিন্তু কিছু মানুষ দূরে থাকলে রাত বড় লাগে।”

কথাটা বলেই সে থেমে গেল।

সে নিজেই বুঝতে পারল না, কেন এমন কথা বের হলো।

মেহর তাকিয়ে রইল।

— “তাহলে দূরে যাওয়া লাগে কেন?”

এই প্রশ্নের উত্তর তার কাছে নেই।

নিচে থেকে তৃষার হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

রায়ান বলল,

— “তৃষা তোকে খুব পছন্দ করে, জানিস?”

মেহর মাথা নাড়ল।

— “জানি।”

— “ও ছোটবেলা থেইকাই এমন।”

— “হুম... কেউ কেউ ছোটবেলার অনুভূতি বড় হয়েও বদলায় না।”

কথাটা হালকা, কিন্তু যেন নিজের বুকেই আঘাত করল সে।

রায়ান হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—
— “তুই বদলাইছিস?”

মেহর আকাশের দিকে তাকাল।
— “সবাই বদলায়। শুধু কেউ সেটা বুঝতে দেয় না।”

রায়ান আর কিছু বলতে পারল না।

আজ প্রথমবার সে অনুভব করল —
মেহরের সাথে কথা বললে তার ভেতরে অদ্ভুত শান্তি নামে।
আর সেই শান্তিটাই তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

পরদিন বিয়ের কেনাকাটার জন্য সবাই বাজারে যাবে ঠিক হলো।

একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। সবাই গাদাগাদি করে উঠছে।

তৃষা আগে গিয়ে রায়ানের পাশে সিট দখল করল।
— “ভাইয়া, তুমি এখানে বসো।”

রায়ান বসে পড়ল।
তার ঠিক পেছনের সিটে বসলো মেহর, রুবিনা চাচির পাশে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।
হাসাহাসি, গান, কথাবার্তা।

হঠাৎ ব্রেক কষতেই তৃষা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রায় রায়ানের উপর।
সে ধরে ফেলল।

সবাই হাসল।

পেছন থেকে মেহর জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। গ্রামের রাস্তা, ধুলা, রোদ—সব ঝাপসা লাগছে।

রুবিনা চাচি বললেন,
— “মেহর, শরীর খারাপ নাকি?”

— “না চাচি, ঠিক আছি।”

কিন্তু তার বুকের ভেতর কেমন যেন চাপা ব্যথা।

বাজারে গিয়ে ভিড়ের মাঝে হঠাৎ মেহর হারিয়ে গেল।

রায়ান খেয়াল করল কয়েক মিনিট পর।
— “মেহর কই?”

তৃষা বলল,
— “এই তো ছিল।”

রায়ানের বুক ধক করে উঠল।
সে চারপাশে খুঁজতে লাগল।

শেষে দেখল, মেহর এক কোণে দাঁড়িয়ে চুড়ির দোকান দেখছে।

— “তোকে না বলে কোথায় যাস?”

মেহর তাকাল।
— “আমি ছোট না। হারায়ে যাবো না।”

— “তাও... না বললে খারাপ লাগে।”

মেহর থেমে গেল।
ধীরে বলল,
— “সবাই খেয়াল করলে হারানোর ভয় কমে যায়।”

রায়ান চুপ।

তার মনে হলো —
সে কি এতদিন খেয়ালই করেনি?

বিকেলে বাসায় ফিরে সবাই ক্লান্ত।

তৃষা নতুন চুড়ি পরে সবার সামনে হাত নেড়ে দেখাচ্ছে।
— “রায়ান ভাইয়া কিনে দিছে!”

সবাই তাকাল।

মেহর চুপচাপ নিজের রুমে ঢুকে গেল।

শারমিন আক্তার সেটা খেয়াল করলেন।
রায়ানকে আস্তে বললেন,
— “মেহরটা আজকাল খুব চুপ হয়ে গেছে। তুই একটু কথা বলিস।”

রায়ান থমকাল।

সে প্রথমবার বুঝল —
মেহরের চুপ থাকা শুধু স্বভাব না, হয়তো অনুভূতি।

রাতে দরজায় টোকা।

রায়ান দরজা খুলে দেখে মেহর দাঁড়িয়ে।

— “মা বলছে, তোর লাগেজ থেকে ওষুধ নিতে।”

রায়ান ব্যাগ খুঁজতে খুঁজতে বলল,
— “তুই আমারে এড়িয়ে চলিস কেন?”

মেহর তাকাল।
— “সবাই তো এড়ায় না। কেউ কেউ জায়গা বুঝে দূরে থাকে।”

— “আমারে দূরে রাখার মতো কী করলাম?”

মেহর হালকা হাসল।
— “সব প্রশ্নের উত্তর মুখে বলা যায় না।”

ওষুধ নিয়ে সে চলে গেল।

রায়ান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনে হলো —
এই মেয়েটা তার জীবনে কতটা জায়গা দখল করে ফেলেছে, সে নিজেই জানে না।সন্ধ্যায় বাড়িতে মেহেদি অনুষ্ঠান।

মেয়েরা একঘরে বসে হাতভর্তি মেহেদি দিচ্ছে। হাসাহাসি, ঠাট্টা, গান—ঘর গরম হয়ে আছে।

তৃষা জোর করে রায়ানকে ভেতরে টেনে আনল।
— “ভাইয়া, দেখো না আমার ডিজাইনটা!”

রায়ান হেসে তার হাতের মেহেদি দেখছে।
মেয়েরা খিলখিল করছে।

ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে মেহর। তার হাতেও মেহেদি, কিন্তু সে কথা বলছে না।

হঠাৎ পাশের এক খালা বললেন—
— “তৃষা আর রায়ানকে পাশাপাশি দেখলে ভালোই লাগে কিন্তু!”

ঘর ভরে উঠল হাসিতে।

মেহরের আঙুল শক্ত হয়ে গেল।
মেহেদির ভেজা নকশা একটু বেঁকে গেল।

রায়ান অস্বস্তিতে হেসে বলল,
— “আরে খালা, আমরা তো ছোটবেলার পার্টনার ইন ক্রাইম।”

কথাটা হালকা, কিন্তু তার চোখ নিজে থেকেই মেহরের দিকে গেল।

মেহর তাকায়নি।

রাতে ঘুম আসছিল না রায়ানের।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, মেহর ছাদে উঠছে।

সে পিছু নিল।

ছাদে গিয়ে দেখে, মেহর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

— “তুই সবসময় আকাশের দিকে তাকাস কেন?”

মেহর ধীরে বলল,

— “আকাশ ভালো। কাছে থাকে, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।”

কথাটা শুনে রায়ানের বুক কেমন করে উঠল।

— “সবকিছু ছোঁয়া লাগে নাকি?”

— “যেগুলা নিজের হয় না, সেগুলা দূর থেইকা দেখলেই সুন্দর লাগে।”

রায়ান চুপ হয়ে গেল।

আজ প্রথমবার সে অনুভব করল—
মেহরের কথাগুলো শুধু কথা না, ইশারা।

কিন্তু সে এখনও বুঝতে ভয় পাচ্ছে।

পরদিন দুপুরে বিদ্যুৎ নেই। সবাই পাখা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে।

মেহর বারান্দায় বসে বই পড়ছিল। রায়ান এসে পাশে বসল।

— “তুই সবসময় বই পড়িস কেন?”
— “বইয়ের মানুষরা কষ্ট দিলে অন্তত কারণ বোঝা যায়।”

— “আমি কি তোকে কষ্ট দিছি?”

মেহর তাকাল।
চোখে শান্ত দুঃখ।

— “তুমি বুঝবা না।”

— “বুঝার চেষ্টা করলে?”

মেহর কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,
— “সবাই চেষ্টা করে না রায়ান... কেউ কেউ শুধু অভ্যাসমতো বাঁচে।”

রায়ানের বুকের ভেতর ভারী লাগতে শুরু করল।

তার মনে হচ্ছে, সে যেন ধীরে ধীরে একটা সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—
যেটা মানে নিলে তার জীবন বদলে যাবে।

দূর থেকে তৃষার ডাক—
— "রায়ান ভাইয়া! আমার ফোনটা দেখো তো!"

মেহর বই বন্ধ করে উঠে গেল।
যাওয়ার সময় শুধু বলল—

"সবসময় দেরি করলে, একসময় জায়গা খালি থাকে না।"

রায়ান বসে রইল।

তার জীবনে প্রথমবার সে বুঝতে শুরু করেছে—

কিছু মানুষকে হারানোর ভয়, ভালো লাগার আগেই জন্ম নেয়।বিকেলের দিকে বাড়িতে আত্মীয়দের ভিড় আরও বেড়েছে। ড্রয়িংরুমে সবাই বসে পুরনো অ্যালবাম দেখছে।

হঠাৎ নাদিয়া আপু একটা ছবি তুলে বলল,
— “এই দেখ, ছোটবেলার রায়ান আর মেহর!”

ছবিতে দুজনেই কাদা মাখা, হাসতে হাসতে একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে।

সবাই হেসে উঠল।

শারমিন আক্তার বললেন,
— “ওরা ছোটবেলায় একে অপর ছাড়া থাকতেই পারত না।”

রায়ান হালকা হেসে মেহরের দিকে তাকাল।
মেহরও তাকিয়েছিল।

কিন্তু দুজনেই কয়েক সেকেন্ড পর চোখ সরিয়ে নিল। ছবির সেই সহজ সম্পর্কটা এখন কোথায় হারিয়ে গেছে?

রাতে ছাদে আবার দেখা।

আজ বাতাসে শীতের হালকা ছোঁয়া।

— “তুই গেলে আবার কবে আসবি?” মেহর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

রায়ান থমকে গেল।
— “কেন? তুই কি দিন গুনবি?”

মেহর হালকা হাসল।
— “না... শুধু জানলে অভ্যাস করতে সুবিধা হয়।”

— “কিসের অভ্যাস?”

— “খালি জায়গার।”

কথাটা বলেই সে আকাশের দিকে তাকাল।

রায়ানের মনে হলো—
সে না থাকলে মেহরের জীবনে একটা শূন্যতা তৈরি হয়...
কিন্তু সে কি কখনো সেটা বুঝেছে?

তৃষা আজ সারাদিন রায়ানের পেছন পেছন ঘুরছে।

ফ্যামিলি গ্রুপে ছবি তুলতে গিয়ে সে ইচ্ছে করে রায়ানের কাঁধে মাথা রাখল।

কেউ কিছু বলল না, সবাই মজা করছে।

কিন্তু মেহর চুপচাপ সরে গেল ভিড় থেকে।

রায়ান সেটা খেয়াল করল এবার।

সে প্রথমবার অনুভব করল—
মেহর দূরে গেলে তার ভেতর অকারণ অস্থিরতা হয়।

তৃষার কথা শুনছে, কিন্তু মন নেই।

রাতে খাওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মেহর।

রায়ান গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

— “তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস।”

— “না। তুমি শুধু দেরিতে খেয়াল করো।”

— “কিসের?”

মেহর তাকাল না।
ধীরে বলল—

“যে মানুষ সবসময় পাশে থাকে, তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না... যতক্ষণ না সে একদিন আর পাশে থাকে না।”

রায়ানের বুকের ভেতর চাপা ব্যথা হলো।

সে বুঝতে পারছে না কেন মেহরের কথা এত গভীর লাগে।

📖 পর্ব ১৫: অদ্ভুত শান্তি

সকালে বিদায় নিতে যাবে এক আত্মীয় পরিবার। সবাই গেটে দাঁড়িয়ে।

ভিড়ের মাঝে হঠাৎ মেহরের হাত রায়ানের হাতে ছুঁয়ে গেল।

এক সেকেন্ড।

কিন্তু দুজনেই হাত সরাল না সঙ্গে সঙ্গে।

চোখে চোখ পড়ল।

কথা নেই, হাসি নেই—
শুধু এক ধরনের অদ্ভুত শান্তি।

তারপর তৃষার গলা—
— “রায়ান ভাইয়া, এখানে আসো!”

মুহূর্তটা ভেঙে গেল।

কিন্তু দুজনেই বুঝল—
কিছু একটা বদলাচ্ছে।

এখনো কেউ প্রেম বুঝে উঠতে পারছে না...
কিন্তু হৃদয় আগে বুঝে ফেলে, মাথা অনেক পরেসকালে নাদিয়া আপুর বিয়ের শাড়ি ট্রায়াল চলছে। ঘরে মেয়েদের ভিড়।

মেহর পিন ঠিক করে দিচ্ছিল। হঠাৎ সুই আঙুলে বিঁধল।

— "আহ!"

রক্তের ছোট ফোঁটা।

রায়ান পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সবার আগে সে এগিয়ে এলো।
— "দেখি! কতবার বলছি সাবধানে করিস।"

সে নিজের রুমাল দিয়ে মেহরের আঙুল চেপে ধরল।

ঘরে কেউ বিষয়টা খেয়াল করল না।
কিন্তু মেহরের বুক ধকধক করতে লাগল।

— “আমি পারব,” সে আস্তে বলল।

রায়ান ধীরে উত্তর দিল—
“সবসময় একা পারতে হয় না।”

কথাটা বলেই সে থেমে গেল। নিজেই বুঝল না কেন এমন বলল।

দুপুরে সবাই ঘুমাচ্ছে। বাড়ি শান্ত।

মেহর বারান্দায় বসে কাপড় ভাঁজ করছিল। রায়ান এসে চুপচাপ পাশে বসলো।

আজ কেউ কথা বলছে না।
তবু অস্বস্তি লাগছে না।

হঠাৎ রায়ান বলল—

— “তোর সাথে চুপ থাকতেও ভালো লাগে।”

মেহরের হাত থেমে গেল।

— “সবাই তো চুপ থাকা সহ্য করতে পারে না,” সে নরম গলায় বলল।

— “হয়তো মানুষটা ঠিক হলে পারে।”

দুজনেই আর কিছু বলল না।
কিন্তু বাতাসে কিছু বদলে গেল।

বিকেলে তৃষা নতুন ড্রেস পরে রায়ানকে দেখাতে এলো।

— “কেমন লাগছে?”

রায়ান স্বাভাবিকভাবে বলল, “ভালো।”

তৃষা হাসতে হাসতে তার পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলল।

এই দৃশ্যটাই সিঁড়ির মাথা থেকে দেখল মেহর।

তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

সে ঘুরে নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

রায়ান পরে খেয়াল করল,
আজ সারাদিন মেহর তার সামনে আসেনি।

অকারণ এক অস্বস্তি বুকের ভেতর গেঁথে রইল।

রাতে বিদ্যুৎ চলে গেল। সবাই উঠোনে বসে গল্প করছে।

রায়ান চারপাশে তাকিয়ে বলল,
— “মেহর কই?”

রুবিনা চাচি বললেন,

— “মাথা ধরছে বলে শুয়ে আছে।”

রায়ানের মন খারাপ হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে মেহরের দরজায় নক করল।

— “ঘুমাস?”

ভেতর থেকে আস্তে উত্তর—

— “হুম।”

— “মাথা বেশি ধরছে?”

— “না... ঠিক আছি।”

— “আমার সাথে রাগ করছিস?”

কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর খুব আস্তে—
“সবাই তো যার যার জায়গা বুঝে নেয়... আমি শুধু আমারটা বুঝতেছি।”

রায়ান দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনে হলো—
মেহর দূরে সরে গেলে ভেতরে ফাঁকা লাগে।

কিন্তু সে এখনও সেই অনুভূতির নাম দেয়নি।

বিয়ের আগের রাত।

বাড়িতে আলো, সাজ, শব্দ—সবচেয়ে ব্যস্ত সময়।

এই ভিড়ের মাঝেই রায়ান বারবার মেহরকে খুঁজছে।

তৃষা এসে বলল,
— “ভাইয়া, কাল তুমি আমার পাশে বসবা, ঠিক আছে?”

রায়ান উত্তর দিল না।
তার চোখ অন্য কাউকে খুঁজছে।

ছাদে গিয়ে দেখল মেহর একা দাঁড়িয়ে।

— “এখানে একা কেন?”

— “নিচে অনেক মানুষ... কিন্তু মাঝে মাঝে ভিড়েও মানুষ একা লাগে।”

রায়ান ধীরে বলল—
— “তুই একা না।”

মেহর তাকাল।
— “সবাই কথায় পাশে থাকে... কাজেও থাকে?”

প্রশ্নটা বাতাসে ঝুলে রইল।

রায়ানের ভেতরে হঠাৎ ভয় ঢুকল—
মেহর যদি সত্যিই একদিন দূরে চলে যায়?

সে বুঝতে পারছে না কেন এই ভয় হচ্ছে।
কিন্তু এই ভয়টাই প্রথম ইশারা।বিয়ের বাড়ি আজ সবচেয়ে ব্যস্ত।

সবার দৌড়াদৌড়ি, সাজগোজ, হাসি — কিন্তু এই ভিড়ের মাঝেও রায়ানের মন অদ্ভুতভাবে ফাঁকা লাগছে।

সে হঠাৎ খেয়াল করল—
অনেকক্ষণ হলো মেহরকে দেখছে না।

তৃষা পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কিন্তু সে শুনছেই না।

— “ভাইয়া, তুমি শুনছো?”

— “হুম... হ্যাঁ...”

কিন্তু তার চোখ বারবার সিঁড়ির দিকে, বারান্দার দিকে, ছাদের দিকে।

শেষমেশ সে নিজেই বুঝল —
সে মেহরকে খুঁজছে।

ছাদে গিয়ে দেখল মেহর এক কোণে বসে আছে, হাঁটু জড়িয়ে।

— “সবাই তোকে খুঁজতেছে।”

— “আমারে খুঁজার মানুষ এত হইলো কবে?” মেহর হালকা হেসে বলল।

রায়ান উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

হঠাৎ তার বুকের ভেতর কেমন ব্যথা করল।

যদি একদিন সত্যিই মেহর না থাকে?
যদি সে দূরে সরে যায়?

এই চিন্তাটাই তাকে অস্থির করে তুলল।

সে ধীরে বলল—
— “তুই দূরে গেলে আমার খারাপ লাগে।”

মেহর তাকাল।
চোখে বিস্ময়।
— “কেন?”

রায়ান উত্তর জানে না।
কিন্তু আজ প্রথমবার সে অনুভূতিটা অস্বীকার করতে পারল না।

নিচে নাচগান শুরু হয়েছে। তৃষা জোর করে রায়ানকে টেনে নিয়ে গেল।

— “ভাইয়া, আমার সাথে একটা ভিডিও!”

রায়ান হাসার চেষ্টা করছে।
কিন্তু ভিড়ের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেহরকে দেখে তার মন অদ্ভুত ভারী হয়ে আছে।

হঠাৎ পাশের এক ছেলে মেহরের সাথে কথা বলতে শুরু করল— দূরের আত্মীয়।

মেহর ভদ্রভাবে হাসছে।

রায়ানের ভেতর হঠাৎ অজানা রাগ উঠল।
সে বুঝতে পারছে না কেন ওই দৃশ্যটা তার সহ্য হচ্ছে না।

সে নিজেই অবাক—
এই অনুভূতি কি তবে...?

রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রায়ান।

নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলল—
“আমি কি... মেহরকে হারানোর ভয় পাই?”

মাথার ভেতর স্মৃতি ভিড় করছে—
ছোটবেলার ঝগড়া, আজকের নীরবতা, তার অভিমান, তার হাসি।

হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে শুধু মেহরকে খেয়াল করছে না—
সে মেহরকে মিস করে,
মেহর দূরে গেলে অস্থির হয়,
অন্য কারও পাশে দেখলে খারাপ লাগে।

ধীরে ধীরে সত্যিটা স্পষ্ট হলো।

সে ফিসফিস করে বলল—

“আমি শেষ...”

কারণ সে জানে—
সে প্রেমে পড়েছে।

ছাদে গিয়ে দেখল মেহর দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদের আলোয় তার চুল উড়ছে।

রায়ান কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার বুকের ভেতর কথাগুলো ধাক্কা মারছে—
বলবে? বলবে না?

সে শুধু ধীরে বলল—

— “তুই থাকলে আমার সব ঠিক লাগে।”

মেহর তাকিয়ে রইল।
চোখে প্রশ্ন, কাঁপা আলো।

রায়ান আর কিছু বলল না।
বলতে ভয় লাগছে।

কারণ সে এখন জানে—
সে মেহরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

কিন্তু এই ভালোবাসা বলার সাহস এখনও জন্মায়নি।
রাত অনেক। বিয়ের বাড়ি ধীরে ধীরে চুপ হয়ে গেছে।

রায়ান একা ছাদে দাঁড়িয়ে। তার ভেতরের অস্থিরতা থামছে না।
সে আস্তে গুনগুন করে —

“তোকে একা দেখার লুকিয়ে কি মজা
সে তো আমি ছাড়া কেউ জানে না...”

এইটুকুই।

তার গলায় চাপা কাঁপন।
সে নিজেও বোঝে না — কেন এই লাইন দুটো শুধু মেহরকে ভাবলেই মনে আসে।

দূরে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে মেহর শুনছে...
সে জানে না গানটা তার জন্য।
কিন্তু তার বুকের ভেতর অদ্ভুত ঢেউ ওঠে।

---পরদিন সকাল।

মেহর রান্নাঘরে চা বানাচ্ছে।
রায়ান ঢুকতেই দুজনের চোখাচোখি।

অকারণে দুজনেই চোখ নামিয়ে নেয়।

রুবিনা চাচি মজা করে বলেন—
— “এই যে তোমরা দুজন, সকাল সকাল এত চুপচাপ কেন?”

মেহর হালকা হেসে বলে,
— “ঘুম পাইছে চাচি।”

রায়ান কাপটা নিতে নিতে আস্তে বলে—
“সব কথা বললেই শব্দ লাগে না।”

মেহর থমকে তাকায়।
তার বুকের ভেতর অদ্ভুত ঢেউ ওঠে।

সে বুঝতে পারছে না —
কিন্তু রায়ানের আশেপাশে এলেই এখন তার নিঃশ্বাস বদলে যায়।

বিয়ের গায়ে হলুদের আয়োজন চলছে।

সবাই ব্যস্ত, হাসি, হলুদের গন্ধ, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

মেহর নাদিয়া আপুর হাতে হলুদ লাগাচ্ছিল।
রায়ান দূর থেকে তাকিয়ে আছে।

তার মনে হচ্ছিল—
এই মেয়েটার হাসি কেন এত আপন লাগে?

তৃষা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল—
— “ভাইয়া, তুমি আজকাল কাকে এত খুঁজো?”

রায়ান চমকে উঠল।
— “কাউকে না তো।”

তৃষা মুচকি হাসল।
— “মুখ কিছু লুকায় না।”

রায়ান আর উত্তর দিল না।
কারণ সত্যিটা সে নিজেই লুকাতে পারছে না।

বিকেলে বিদায়ের সময়, সবাই ছবি তুলছে।

হঠাৎ ভিড়ের ধাক্কায় মেহর হোঁচট খেল।
রায়ান ঝট করে তার হাত ধরে ফেলল।

কয়েক সেকেন্ড...
কেউ হাত ছাড়ল না।

চারপাশে শব্দ, হাসি, ডাকে ভরা ভিড় —
কিন্তু তাদের মাঝখানে নিঃশব্দ কিছু তৈরি হয়ে গেল।

মেহর ধীরে বলল—
— “ছাড়ো... সবাই দেখছে।”

রায়ান ফিসফিস করে উত্তর দিল—

— “ধরতে ভয় লাগে না... ছাড়তেই ভয় লাগে।”

মেহরের বুক কেঁপে উঠল।সকালবেলা মেহর ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। হাত ভিজে ছিল, কাপড়ের ঝুড়িটা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে রায়ান ঝুড়িটা নিয়ে নিল।

— “ভেজা হাতে ভারী জিনিস তুলিস না।”

মেহর অবাক।

— “আমি পারতাম।”

— “জানি। তাও ধরলাম।”

ছোট্ট কথা।

কিন্তু মেহরের বুকের ভেতর অদ্ভুত নরম কিছু গলে গেল।

দুপুরে সবার আড্ডা চলছে, কিন্তু মেহর চুপচাপ বারান্দায় বসে ছিল।

রায়ান কিছু না বলে তার পাশে এক গ্লাস লেবুর শরবত রেখে দিল।

— “তোর মাথা ধরছিল না কাল?”

মেহর তাকাল।
সে কাউকে বলেনি মাথা ধরার কথা... শুধু রুবিনা চাচিকে বলেছিল।

— “মনে ছিল?”

— “সব কথা ভুলে যাই না।”

মেহর হালকা হেসে শরবত খেল।

তার মনে হলো—

কেউ তাকে লক্ষ্য করে।

বাজার থেকে ফেরার সময় রোদ খুব ছিল।

মেহর চোখ কুঁচকে হাঁটছিল।

হঠাৎ রায়ান নিজের সানগ্লাস খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

— “পরে নে।”

— “তুই?”

— “আমি রোদে পুড়লে কালো হবো, তুই পুড়লে বকা খাবো।”

মেহর হেসে ফেলল।

এই হাসিটা দেখে রায়ানের বুক হালকা হয়ে গেল।

মেহর বুঝল না কেন—
এই ছেলেটার ছোট ছোট কথাগুলো এখন তার দিন বদলে দেয়।

বাড়িতে আত্মীয়রা এসেছে। ভিড়, শব্দ, বিশৃঙ্খলা।

মেহর ট্রে হাতে হাঁটছিল, হঠাৎ পা পিছলে গেল।
ট্রে পড়ার আগেই রায়ান ধরে ফেলল।

— “সাবধানে!”

তার হাত এখনো মেহরের কাঁধে।

দুজনেই কয়েক সেকেন্ড চুপ।

চারপাশের ভিড় মিলিয়ে যায় যেন।

মেহর ধীরে বলল—

— “সবসময় ধরতে পারবা?”

রায়ান নরম গলায় বলল—

— “চেষ্টা করবো... যতক্ষণ পারি।”

এই কথাটা মেহরের মনে গেঁথে রইল।

রাতে বিছানায় শুয়ে মেহর ভাবছিল।

রায়ান কি আগে এমন ছিল?

নাকি সে নিজেই আগে খেয়াল করেনি?

তার মনে পড়ছে—

শরবত, সানগ্লাস, ঝুড়ি ধরা, পড়ে যাওয়ার আগে সামলে নেওয়া...

এগুলো বড় কিছু না।
তবু কেন যেন তার বুকের ভেতর নরম আলো জ্বলে উঠছে।

সে ধীরে ফিসফিস করে বলল—
“রায়ান বদলেছে... নাকি আমার মনটাই বদলাচ্ছে?”

অন্যদিকে নিজের ঘরে রায়ান জানালার পাশে দাঁড়িয়ে।

সে শুধু একটা কথাই ভাবে—
মেহর যেন কখনো কষ্ট না পায়।

আর এই চাওয়াটার নাম কী...
সে জানে।
কিন্তু এখনো মুখে আনার সাহস নেই।সকাল থেকে বাড়িতে অনেক কাজ।
মেহর বারবার নিজের অজান্তেই একটা জিনিস খেয়াল করছে—

রায়ান কোথায়?

সে নিজেই বিরক্ত হয়ে ভাবল,
“আমি ওকে খুঁজতেছি কেন?”

ঠিক তখনই পেছন থেকে গলা—
— “এইটা তোর ওড়না না?”

রায়ান তার ওড়নাটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে।

মেহর থমকে গেল।
সে খেয়ালই করেনি কখন ওড়নাটা পড়ে গেছে।

— “তুই সব দেখিস নাকি?”

রায়ান হালকা হাসল।
— “যা দরকার, তা দেখি।”

মেহরের বুক ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠল।

দুপুরে সবাই একসাথে খাচ্ছিল।
রায়ান তৃষাদের টেবিলে বসে ছিল, গল্প করছিল।

মেহর চুপচাপ অন্য পাশে বসে রইল।
খাওয়া শেষ করেই উঠে গেল।

রায়ান খেয়াল করল।

কিছুক্ষণ পর বারান্দায় গিয়ে দেখল মেহর গাছের টবে পানি দিচ্ছে।

— “খাওয়া শেষ?”

— “হুম।”

— “কম খাইছিস।”

— “তোর খেয়াল করার দরকার নাই।”

রায়ান থেমে গেল।
ধীরে বলল—
— “তোর ব্যাপারে খেয়াল না করে থাকতে পারি না।”

মেহরের হাত কেঁপে গেল।
সে মুখ ঘুরিয়ে বলল—
— “সবাইকে এমন বলিস?”

— “না। তোকে বলি।”

এই প্রথমবার কথাটা সরাসরি শোনার পর
মেহরের অভিমানটা গলে জল হয়ে গেল।

বিকেলে বিদ্যুৎ ছিল না। সবাই উঠোনে বসে গল্প করছে।

হঠাৎ রায়ান একটা পুরনো ঘটনার কথা বলল—

মেহর ছোটবেলায় রেগে গিয়ে তার খাতা ছিঁড়ে ফেলেছিল।

সবাই হেসে উঠল।
মেহর লজ্জা পেয়ে বলল—
— “পুরনো কথা বলিস কেন!”

রায়ান হেসে উত্তর দিল—
— “কারণ ওই রাগী মেয়েটা এখন চুপচাপ হয়ে গেছে।”

— “আমি চুপচাপ?”

— “হুম... কিন্তু চোখ দুইটা আগের মতোই।”

মেহর চুপ হয়ে গেল।

কারণ সে বুঝল—
রায়ান শুধু এখনকার তাকে না, ছোটবেলার তাকেও মনে রাখে।

📖 পর্ব ৩৯: ভরসা

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মেহরের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেল।

সে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রায়ান নিচে বসে নিজের হাতেই সেটার স্ট্র্যাপ ঠিক করতে লাগল।

— “থাক, আমি পারবো।”

— “চুপচাপ দাঁড়া।”

তার কণ্ঠে আজ আদেশের চেয়ে যত্ন বেশি।

ঠিক হয়ে গেলে সে বলল—

— “এবার হাঁট, পড়ে গেলে কিন্তু ধরবো না।”

মেহর হেসে ফেলল।

— “মিথ্যা। ধরবাই।”

রায়ান তাকিয়ে রইল।

— “হ্যাঁ... ধরবো।”

দুজনেই জানে—

কথাটা শুধু স্যান্ডেল নিয়ে না।

রাতে শুয়ে মেহর আজ স্বীকার করল—

রায়ান পাশে থাকলে তার মন শান্ত লাগে।

রায়ান কথা বললে ভালো লাগে।

রায়ান না থাকলে অকারণ ফাঁকা লাগে।

সে চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করল—
“এইটা কি... শুধু আপন ভাব?”

অন্যদিকে রায়ান জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

তার ঠোঁটে হালকা হাসি।
কারণ আজ সে দেখেছে—
মেহর রাগ করলে সে কষ্ট পায়,
মেহর হাসলে তার দিন ভালো হয়।

ভালোবাসা এখনো বলা হয়নি—সকালে রান্নাঘরে রুবিনা চাচি, নাদিয়া আপু আর ফারহান ভাইয়ের মা গল্প করছে।

— “এই মেহর মাইয়াটা কিন্তু সব কাজ চুপচাপ সামলায়,” রুবিনা চাচি বললেন।
— “হ্যাঁ রে, এখনকার মেয়েদের মতো না,” আরেকজন যোগ দিলেন।

মেহর চুপচাপ রুটি বেলছিল।

ঠিক তখন রায়ান ঢুকে বলল,
— “চাচি, গ্যাসটা কমাইছেন? রুটি পুড়তেছে।”

রুবিনা চাচি হেসে বললেন,
— “তুই কবে থেকে রান্না বোঝা শুরু করলি?”

রায়ান কাঁধ ঝাঁকালো,
— “যখন থেকে কেউ না দেখলে খেয়াল করতে হয়।”

মেহর মাথা নিচু করে হাসল।
কথাটা কেউ ধরল না — শুধু সে।

ড্রইংরুমে বড়রা বসে কথা বলছে।

মেহরের বাবা বললেন,
— “রায়ান তো এখন ভালো চাকরি করছে, বিদেশে থেকেও ছেলেটা একদম বদলায় নাই।”

রায়ানের মা গর্ব করে বললেন,
— “ও ছোটবেলা থেকেই দায়িত্বশীল।”

পাশ দিয়ে পানি নিয়ে যাচ্ছিল মেহর।
রায়ান সোফা থেকে উঠে ট্রেটা তার হাত থেকে নিয়ে বলল,
— “আমি দিচ্ছি।”

তার মা অবাক হয়ে বললেন,
— “ওরে কাজ করতে দেখতেছি আজকাল!”

সবাই হেসে উঠল।

মেহর চুপচাপ অন্যদিকে চলে গেল,
কিন্তু তার ভেতরে নরম একটা আলো জ্বলে উঠল।

বিকেলে কাজিনরা সবাই ছাদে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

তৃষা বলল,
— “আমাদের মধ্যে কে আগে বিয়ে করবি?”

একজন বলল, “রায়ান ভাইয়া তো বিদেশ ফেরত, ওরই আগে!”

সবাই মজা করে তাকাল।

রায়ান হেসে উড়িয়ে দিল,
— “আমারে বাদ দাও।”

মেহর পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় তুলছিল।
তার হাত থেমে গেল এক মুহূর্তের জন্য।

তৃষা আবার বলল,
— “তাহলে ভাইয়া কেমন মেয়ে পছন্দ?”

রায়ান হালকা গলায় বলল,
— “শান্ত... কিন্তু ভিতরে শক্ত।”

কেউ গুরুত্ব দিল না কথাটায়।
শুধু মেহরের বুক ধক করে উঠল।

রাতে সবাই খেতে বসেছে।

মেহর ঝাল খেতে পারে না — এটা কেউ বিশেষ খেয়াল রাখে না।

রায়ান নিজের প্লেট থেকে আলুর ভাজিটা তার প্লেটে দিয়ে বলল,
— “এইটা খা, কম ঝাল।”

রুবিনা চাচি বললেন,
— “তুই কেমনে জানিস ও ঝাল খাইতে পারে না?”

রায়ান থেমে গেল এক সেকেন্ড।
তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল,
— “ছোটবেলা থেকে জানি।”

মেহর মাথা নিচু করে খেতে লাগল।
তার ঠোঁটের কোণে লুকানো হাসি।

রাতে নিজের ঘরে বসে মেহর ভাবছে—

আজ সারাদিন রায়ান তার জন্য কত ছোট ছোট কাজ করেছে।
কিন্তু সবার সামনে সবকিছুই স্বাভাবিক।
কেউ কিছু বুঝছে না।

তার বুকের ভেতর ধীরে ধীরে স্বীকারোক্তি জন্ম নিচ্ছে —

রায়ান আলাদা।

অন্যদিকে রায়ান ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবে—

সে এখন সাবধানে চলে।
কারণ তার চোখে যা আছে,
তা কেউ দেখে ফেললে সব বদলে যাবে।

তাই সে চুপ।ড্রইংরুমে আজ পরিবেশ একটু ভারী।

মেহরের বাবা কাগজপত্র দেখে বললেন,
— “সময়টা ভালো না রে... খরচ অনেক বেড়ে গেছে।”

রায়ান চুপচাপ শুনছিল।
তারপর শান্ত গলায় বলল,
— “চাচা, দরকার হলে কিছু আমি দেখবো। আপনি একা ভাববেন না।”

ঘরে হালকা নীরবতা নেমে এলো।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মেহর শুনছিল।

তার মনে হলো—

এই ছেলেটা শুধু হাসিখুশি না... ভরসাও।

রাতে রান্নাঘরে রায়ানের মা মেহরকে বললেন,

— “মা, তুই খুব চুপচাপ থাকিস এখন।”

মেহর হেসে বলল,

— “কোথায় খালা, আগের মতোই তো আছি।”

— “হুম... কিন্তু চোখে অনেক কথা থাকে।”

মেহর থমকে গেল।

ঠিক তখনই রায়ান ঢুকে বলল,

— “মা, আমার শার্টটা দেখছো?”

কথা ঘুরে গেল।

কিন্তু দুজনেই অকারণে অস্বস্তি অনুভব করল।

বাড়িতে আবার আত্মীয় এসেছে।

সবাই গল্প করছে, হাসছে।
মেহর সবার জন্য চা দিচ্ছিল।

এক আন্টি বললেন,
— “মেয়েটা খুব শান্ত স্বভাবের।”

রায়ান পাশে দাঁড়িয়ে হালকা গলায় বলল,
— “শান্ত... কিন্তু অনেক শক্ত।”

কেউ কথাটা ধরল না।
কিন্তু মেহরের হাত কাপে লেগে কেঁপে উঠল।

মেহরের হালকা জ্বর।

সে কাউকে কিছু বলেনি।
শুধু চুপচাপ শুয়ে ছিল।

রায়ান দরজায় নক করল।
— “ঘুমাস?”

— “না...”

সে ভেতরে এসে টেবিলে ওষুধ আর পানি রাখল।
— “চাচি বলল তোর গা গরম।”

মেহর অবাক।
— “তুই জানলি কেমনে?”

— “তোকে না দেখলে বুঝি।”

কথাটা বলে সে দ্রুত বের হয়ে গেল।

মেহর ওষুধ হাতে নিয়ে বসে রইল।
তার চোখ ভিজে উঠল অকারণে।

রাতে বৃষ্টি পড়ছে আবার।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রায়ান নিচে তাকিয়ে ছিল।
হঠাৎ দেখল মেহরও অন্য পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে।

দুজনের চোখাচোখি হলো।
কেউ হাসল না, কিছু বলল না।

তবু দুজনের মনেই একই অনুভূতি—

এই নীরব সঙ্গটাই এখন সবচেয়ে আপন।বাড়িতে আজ হঠাৎ করেই জমে গেল আড্ডা। কাজিনরা ঠিক করল — রাতে ছাদে গানের আসর বসবে।

চাদর পাতা, হালকা বাতি, চা আর ঝালমুড়ি।

তৃষা বলল,
— “আজ কিন্তু সবাইকে গান গাইতে হবে!”

রায়ান হেসে বলল,
— “আমারে বাদ দাও।”

সবাই একসাথে, “না না না!”

মেহর চুপচাপ কোণায় বসে ছিল।

শেষমেশ রায়ানকে ধরেই বসানো হলো।

সে একটু হেসে বলল,
— “ভুল হইলে কিন্তু হাসবা না।”

তার চোখ ধীরে ধীরে গিয়ে থামল মেহরের দিকে।

তারপর সে গাইতে শুরু করল—

“বলতে চেয়ে মনে হয় বলতে তবু দেয় না
হৃদয় কতটা তোমায় ভালোবাসি
চলতে গিয়ে মনে হয় দূরত্ব কিছু নয়
তোমারই কাছে ফিরে আসি...”

ছাদে হালকা নীরবতা নেমে এলো।

সবাই ভাবল সাধারণ একটা গান।

কিন্তু মেহরের বুকের ভেতর কাঁপন ছড়িয়ে গেল।

সে চোখ সরিয়ে নিল।
তবু বুঝল— এই গানটা সবার জন্য না।

গান শেষ হতেই ফারহান বলল,
— “ওই ভাইয়া, বিদেশে গিয়ে প্রেম করছো নাকি?”

সবাই হেসে উঠল।

রায়ান হেসে মাথা নেড়ে বলল,
— “সময় কই!”

কেউ খেয়াল করল না—
এই কথা বলার সময় তার চোখ আবার একবার মেহরের দিকেই গিয়েছিল।

মেহর মাথা নিচু করে বসে রইল।
তার গাল লাল হয়ে উঠেছে।

তৃষা হঠাৎ বলল,
— “মেহর আপু! এবার তোমার গান!”

— “না না, আমি পারবো না,” মেহর লজ্জা পেল।

রুবিনা চাচি নিচ থেকে বললেন,
— “গা মা, ছোটবেলায় তো সারাদিন গাইতা!”

সবাই জোর করায় মেহর ধীরে বসলো।

গাইবার আগে সে একবার তাকাল—
রায়ান স্থির চোখে তার দিকেই তাকিয়ে।

তার গলা কাঁপছিল, তবু সে গাইল—

“আমার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নগুলো দেখনা
স্বপ্নগুলো দেখনা, স্বপ্নগুলো দেখনা...”

গান শেষ হতেই সবাই হাততালি দিল।

কেউ বুঝল না—
এই গান দুটো ছাদের বাতাসে একে অন্যের কাছে পৌঁছে গেছে।গানের আসর ভেঙে গেছে।
হাসি, শব্দ, গল্প—সব ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেছে সবার সাথে।

ছাদে শুধু হালকা বাতাস আর ঝুলে থাকা কিছু আলো।

মেহর একা রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
তার বুকের ভেতর এখনো গানের শব্দ বাজছে।

পেছন থেকে ধীরে পায়ের শব্দ।
রায়ান এসে একটু দূরে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না।

তারপর রায়ান আস্তে বলল,
— “গাইতে গিয়ে ভয় পাইছিলি?”

মেহর হালকা হেসে বলল,
— “হুম... গলা কাঁপতেছিল।”

— “কিন্তু গানটা সুন্দর ছিল।”

— “সবাইয়ের জন্যই তো গাইলাম...”

রায়ান একটু থামল।
তার গলায় চাপা কিছু—
— “হুম... সবার জন্য।”

কথাটা বললেও তার চোখ বলছিল অন্য কথা।

মেহর এবার তাকাল।
চোখে চোখ আটকে গেল কয়েক সেকেন্ড।

দুজনেই বুঝল—
আজকের গান শুধু গানের মধ্যে আটকে থাকেনি।

নিচ থেকে কারও ডাক ভেসে এলো—
“মেহর! কোথায়?”

সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।
সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে একবার ফিরে তাকাল।

রায়ান তখনো দাঁড়িয়ে।
হালকা হাসি মুখে, কিন্তু চোখ ভরা অস্বীকার করা না-পারা সত্য।ছাদ থেকে নামার পরও মেহরের বুকের ধকধক থামছিল না।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে তাকাল।

গাল এখনো হালকা লাল, চোখে অদ্ভুত ঝিলিক।

“এমন লাগতেছে কেন...” সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল।

অন্যদিকে রায়ান এখনো ছাদে।

চাঁদের আলো তার মুখের একপাশে পড়েছে। লম্বা দেহ, হালকা দাড়ি, চোখে সেই গভীর শান্ত দৃষ্টি—
যে দৃষ্টিতে হাসি কম, অনুভূতি বেশি।

সে হাত দুটো রেলিংয়ে রেখে নিচের অন্ধকার রাস্তায় তাকিয়ে আছে।
মাথার ভেতর শুধু একটাই মুখ ঘুরছে— মেহর।

তার এলোমেলো খোলা চুল, হাসলে চোখ চিকচিক করা, রাগ করলে ঠোঁট ফুলে থাকা—
সবকিছু যেন আজ নতুন করে নজরে পড়ছে।

রায়ান ধীরে নিজের মনে বলল,

— “এভাবে তাকানো বন্ধ করা উচিত...”

কিন্তু সে জানে— সে পারবে না।

সকালে নাস্তার টেবিলে সবাই বসেছে।

মেহর চা দিচ্ছিল। হঠাৎ রায়ানের কাপ দিতে গিয়ে হাত ছুঁয়ে গেল।

দুজনেই একসাথে হাত সরিয়ে নিল।

তৃষা মজা করে বলল,
— “ওইহ্ কি লজ্জা!”

মেহর দ্রুত বলল,
— “গরম চা ছিল!”

রায়ান মুখ ঘুরিয়ে হালকা হেসে ফেলল।

কেউ বিষয়টা সিরিয়াসলি নিল না।
কিন্তু দুজনের মনেই কাল রাতের ছাদের নীরবতা এখনো রয়ে গেছে।

দুপুরে বারান্দায় কাপড় শুকাতে দিয়েছে মেহর।

হাওয়া বইছে, তার চুল উড়ছে মুখের পাশে।

রায়ান নিচে থেকে ডাক দিল,
— “ওড়নাটা পড়ে যাবে!”

মেহর তাকাতেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, ওড়নাটা ঠিক করে দিল।

তার আঙুল ছুঁয়ে গেল মেহরের কাঁধ।

দুজনেই থেমে গেল এক সেকেন্ড।

রায়ানের চোখ গভীর, শান্ত... কিন্তু ভেতরে ঝড় লুকানো।
মেহরের চোখে দ্বিধা, লজ্জা, আর অজানা টান।

— “ধন্যবাদ...” মেহর আস্তে বলল।

— “সবসময়,” রায়ানের উত্তর।

শব্দ ছোট।
কিন্তু প্রতিশ্রুতির মতো শোনাল।

ড্রইংরুমে সবাই বসে টিভি দেখছে।

ফারহান মজা করে বলল,

— “এই বাড়িতে সবচেয়ে সিরিয়াস কে?”

তৃষা বলল,
— “রায়ান ভাইয়া!”

মেহর হেসে ফেলল।

রায়ান তাকিয়ে বলল,
— “আমি না, আমি খুব ভালো মানুষ।”

মেহর নিচু গলায় বলল,
— “হুম, জানি।”

রায়ান শুনে ফেলল।
তার চোখে হালকা অবাক হাসি।

চারপাশে সবাই কথা বলছে—
কিন্তু তাদের ছোট ছোট কথাগুলো আলাদা এক দুনিয়া বানিয়ে ফেলছে।

রাতে মেহর ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল।

হঠাৎ বাতাসে তার চুল মুখে এসে পড়ল।

রায়ান এগিয়ে এসে আস্তে করে চুল সরিয়ে দিল।

তার আঙুল ছুঁতেই মেহরের নিঃশ্বাস আটকে গেল।

দুজনেই চুপ।

চাঁদের আলোয় তাদের ছায়া মিশে গেছে মেঝেতে।

রায়ান ধীরে বলল,
— “ঠান্ডা লাগবে, নিচে যা।”

মেহর মাথা নেড়ে নামতে গেল।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে একবার ফিরে তাকাল।

রায়ান এখনো তাকিয়ে।

আজ আর কেউ গান গায়নি।
কেউ ভালোবাসি বলেনি।

তবু আজকের নীরব ছোঁয়া
হাজার কথার চেয়েও বেশি জোরে বাজল দুজনের মনেবিকেলে সবাই মিলে বাইরে যাওয়ার প্ল্যান হলো।

তৃষা চিৎকার করে বলল,
— “আজকে সবাই বের হবো! কেউ না বললে রাগ করবো!”

মেহর প্রথমে যেতে চাইছিল না।
কিন্তু খালা বললেন,
— “সবসময় ঘরে থাকলে মন আরও খারাপ হয় মা, যাও।”

রায়ান চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।
সে শুধু বলল,
— “আমি গাড়ি বের করছি।”

মেহর চুপচাপ ওড়না নিল।
দুজনের চোখ একবার মিলল—
অকারণ এক নীরব বোঝাপড়া।

গাড়ির জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে।
তৃষা আর ফারহান পেছনে ঝগড়া করছে গান নিয়ে।

— “রোমান্টিক গান দে!”
— “না, ডান্স গান!”

রায়ান আয়নায় তাকিয়ে দেখল মেহর জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।
তার চুল বাতাসে উড়ছে।

রায়ানের ঠোঁটে হালকা হাসি।
সে ভলিউম কমিয়ে দিল, যেন শব্দে তার ভাবনা ভেঙে না যায়।

হঠাৎ ব্রেক কষতেই মেহর সামান্য সামনে ঝুঁকে পড়ল।

রায়ানের হাত দ্রুত এগিয়ে তার কাঁধ ছুঁয়ে ধরে ফেলল।
— “সরি... রাস্তা খারাপ।”

মেহর আস্তে বলল,
— “থ্যাংক ইউ...”

ফারহান পেছন থেকে বলল,
— “উফফ, কেয়ারিং লেভেল দেখছিস তৃষা?”

মেহর লজ্জায় জানালার বাইরে তাকাল।

রাস্তার পাশে ফুচকার দোকানে সবাই দাঁড়িয়ে।

তৃষা বলল,
— “মেহর আপু, ঝাল খাইতে পারো?”

মেহর মাথা নাড়ল,
— “একদম না!”

রায়ান দোকানদারকে বলল,
— “ওরটা একদম কম ঝাল করবেন।”

মেহর তাকিয়ে বলল,
— “তুমি কিভাবে জানলে?”

রায়ান কাঁধ ঝাঁকালো,
— “মুখ দেখলেই বোঝা যায়।”

তৃষা ধীরে ফারহানকে বলল,
— “ওদের কেমিস্ট্রি আলাদা লেভেল।”

দুজনেই হেসে ফেলল।

মেহর ফুচকা খেয়ে চোখ বড় করে বলল,
— “এটা তো ঝাল না!”

রায়ান মুচকি হেসে বলল,
— “আমি আছি না।”

শব্দটা সাধারণ।
কিন্তু মেহরের ভেতরে অদ্ভুত কাঁপন তুলল।

রাতে সবাই ড্রইংরুমে বসে গল্প করছে।

খালামণি পুরনো দিনের গল্প বলছেন।
হাসির শব্দে ঘর ভরে গেছে।

মেহর রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে আসছিল।
রায়ান এগিয়ে ট্রে নিয়ে বলল,
— “আমি দিচ্ছি।”

খালামণি হেসে বললেন,
— “বিদেশ থেকে এসে ছেলেটা একদম ঘরোয়া হয়ে গেছে!”

ফুপু মজা করে বললেন,
— “বাড়িতে আসার পর মানুষ বদলায়।”

মেহর চুপ করে শুনছিল।
তার অজান্তেই ঠোঁটে হাসি।

রায়ান দূর থেকে দেখছিল—
পরিবারের মাঝে মেহরকে আজ তার নিজের খুব কাছের মনে হচ্ছে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেহর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল।

রায়ান পানির বোতল নিতে এসে থেমে গেল।
— “ঘুমাওনি?”

— “ঘুম আসছে না।”

দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়াল, মাঝখানে অল্প দূরত্ব।

রায়ান বলল,
— “আজকে ভালো লাগছিল তোমাকে... হাসতে।”

মেহর ধীরে বলল,
— “অনেকদিন পর হাসলাম।”

রায়ান তাকিয়ে রইল।

চোখে নরম আলো।

— “হাসিটা ধরে রাখো... প্লিজ।”

মেহরের বুক কেঁপে উঠল।
এত সাধারণ একটা কথা—
তবু এত যত্ন লুকানো।

দূরে রাতের হাওয়া বইছে।
দুজনেই চুপ।
কিন্তু নীরবতার ভেতর তাদের দূরত্ব একটু করে কমে যাচ্ছে...সকালে ছাদে গাছে পানি দিচ্ছিল মেহর।

রায়ান এসে হঠাৎ বলল,
— “বিকেলে একটু বাইরে যাবে?”

মেহর অবাক,
— “কোথায়?”

— “এমনি... আইসক্রিম খেতে। সবার সাথে না... শুধু আমরা।”

মেহরের হাত থেমে গেল। বুকের ভেতর কেমন কাঁপন।

— “যদি কেউ দেখে?”

রায়ান হালকা হেসে বলল,
— “দেখলে বলবো কাজ ছিল।”

মেহর না বলল না... হ্যাঁও বলল না।
কিন্তু তার নীরবতাই ছিল সম্মতি।

দূর থেকে ট্রিশা সব দেখছিল।
তার চোখ সরু হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় তারা পাড়ার একটু দূরের লেকের পাশে বসে।

হালকা বাতাস, পানিতে আলো ঝিকমিক করছে।

মেহর ধীরে বলল,
— “আমরা কি ভুল করছি?”

রায়ান তাকিয়ে রইল তার দিকে।
চোখে একদম শান্ত অথচ গভীর অনুভূতি।

— “যদি তোমার সাথে সময় কাটানো ভুল হয়... তাহলে আমি ঠিক হতে চাই না।”

মেহরের বুক ধড়ফড়।

এত সরাসরি কথা সে আগে কখনো শোনেনি তার মুখে।

দূরে দাঁড়িয়ে ট্রিশা ফোনে ছবি তুলল চুপিচুপি।
তার ঠোঁটে হিংসার হাসি।

— “দেখি কতদূর যাও...” সে বিড়বিড় করল।

রাতে ড্রইংরুমে বড়রা বসে কথা বলছে।

রায়ানের মা বললেন,
— “এবার ছেলের বিয়ের কথা ভাবতে হবে।”

খালা বললেন,
— “হ্যাঁ, বিদেশ ফেরত ছেলে, প্রপোজাল তো অনেক।”

রায়ান ঢুকতেই বাবা বললেন,
— “তোর জন্য একটা ভালো মেয়ের খবর এসেছে।”

রায়ানের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

— “আমি এখন বিয়ের জন্য রেডি না।”

— “কেন? কারও সাথে কিছু আছে?” মা জিজ্ঞেস করলেন।

রায়ান এক সেকেন্ড থেমে বলল,
— “না। কিন্তু জোর করে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো না।”

তার কণ্ঠে চাপা রাগ।

মেহর রান্নাঘর থেকে সব শুনছিল।
তার হাত কাঁপছে।

সে জানে— কথাগুলো তার জন্য।
তবু তার নাম কেউ জানে না।

ট্রিশা ইচ্ছে করে মেহরকে বলল,
— “রায়ান ভাইয়ার বিয়ের কথা চলছে জানো?”

মেহরের মুখ সাদা হয়ে গেল।
— “ও... তাই?”

— “হ্যাঁ। বিদেশ ফেরত ছেলে, ভালো ফ্যামিলি... মেয়ের অভাব নাকি!”

ট্রিশা মুচকি হাসল।

মেহর কিছু বলল না।
কিন্তু সেদিন সে রায়ানের দিকে তাকায়নি একবারও।

রায়ান বুঝতে পারছিল— কিছু একটা বদলে গেছে।

রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে রায়ান বলল,

— “তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?”

মেহর কাঁপা গলায় বলল,
— “তোমার তো বিয়ের কথা চলছে... আমার সাথে এভাবে ঘোরা ঠিক না।”

রায়ান এক ধাপ এগিয়ে এলো।

— “সব কথা সবাইকে বলা যায় না...
কিন্তু কিছু অনুভূতি শুধু একজনের জন্যই থাকে।”

মেহরের চোখ ভিজে উঠল।

— “আমার ভয় লাগে...”

রায়ান আস্তে বলল,
— “আমারও লাগে। তবু... তোমার কাছ থেকে দূরে থাকার ভয়টা বেশি।”

দুজনেই চুপ।

চাঁদের আলোয় তাদের মাঝের দূরত্ব আর আগের মতো নেই।

দূরে দাঁড়িয়ে ট্রিশা ছাদে উঠতে গিয়ে থেমে গেল।
এই নীরবতা তার ভালো লাগল না একদম।

তার চোখে এখন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত—বিকেলটা অদ্ভুত সুন্দর ছিল।

রায়ান সারাদিন অস্থির।
মেহর বুঝতে পারছিল কিছু একটা আলাদা... কিন্তু কী?

— “কোথায় যাচ্ছি আমরা?”
মেহর গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করল।

রায়ান শুধু হালকা হাসল।
— “আজ প্রশ্ন কম, বিশ্বাস বেশি।”

গাড়ি এসে থামল একটা শান্ত পার্কে।

ভেতরে ঢুকতেই মেহর থমকে দাঁড়াল।

ছোট ছোট লাইট গাছে ঝুলছে।
ফুলের পাপড়ি ছড়ানো পথ।
আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে রায়ানের কয়েকজন বন্ধু তালি দিয়ে বলল—

— “Welcome bhabi!” 😄

মেহর পুরো অবাক।
— “এগুলো কী...?”

রায়ান আস্তে বলল,
— “একটু দাঁড়াও... প্লিজ।”

সে ইশারায় বন্ধুদের দূরে যেতে বলল।

মেহর দাঁড়িয়ে আছে লাইটের নরম আলোয়।
তার চোখে প্রশ্ন, বুকের ভেতর ধকধক।

রায়ান ধীরে তার সামনে এসে দাঁড়াল।
হাতে একটা ফুলের বুকে... আর ছোট্ট একটা বক্স।

তার কণ্ঠ কাঁপছিল, তবু চোখ দৃঢ়।

সে হাঁটু গেড়ে বসল।

মেহরের নিঃশ্বাস থেমে গেল।

রায়ান বলল —

**“আমি তোকে অনেক ভালোবাসি, মেহর...
আমি কখনো তোকে বলতে পারিনি।
আমার হৃদয়ের পুরোটা জুড়ে শুধু তুই...
এই হৃদয়ে শুধু মেহরেরই রাজত্ব চলবে।

আমি ভাবতাম তুই হয়তো আমার প্রতি সিরিয়াস না...

তাই চুপ ছিলাম।
কিন্তু যখন বুঝলাম... তখন আর না বলে পারলাম না।

আমি তোকে ছাড়া থাকতে পারবো না।
আমাকে যদি কেউ বলে তোকে ভুলতে—
আমি তাকেই ভুলে যাবো, কিন্তু তোকে না।

এই রায়ানের দুনিয়া... শুধু মেহরের। আর কারো না।”**

সে বক্সটা খুলল।
ভেতরে ডায়মন্ড রিং ঝলমল করছে আলোয়।

— “তুই কি আমার সাথে সারাজীবন থাকবি?”

মেহরের চোখ ভরে গেছে।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে একের পর এক।

সে কাঁপা গলায় বলল,
— “আমি তোর জন্য কতদিন অপেক্ষা করেছি জানিস?
কথা বলবি না, দূরে থাকবি... এত অভিমান দেখাবি আমার সাথে?”

রায়ান ধীরে উঠে দাঁড়াল।
পেছনে ইশারা করতেই বন্ধুরা চুপচাপ সরে গেল।

এখন পুরো পার্কে শুধু তারা দুজন... আর নরম আলো।

রায়ান এগিয়ে এসে মেহরের হাত ধরল।

প্রথমবার কোনো ছেলের স্পর্শ—
মেহরের শরীর কেঁপে উঠল।
বুক ধড়ফড় করছে, শ্বাস এলোমেলো।

রায়ান আস্তে তাকে কাছে টেনে নিল।
তার কপালে নরম করে চুমু দিল।

— “তোকেই বিয়ে করবো। তুই আমার বউ... বুঝলি? তুই আর কখনো কাঁদবি না।”

মেহর চোখ বন্ধ করে তার বুকে মুখ লুকিয়ে দিল।

চারপাশে বাতাস বয়ে গেল, লাইটগুলো ঝিলমিল করল—মেহরের কাঁপা হাতে রায়ান আস্তে করে রিংটা পরিয়ে দিল।

আংটির ছোট্ট হিরেটা লাইটের নিচে ঝলমল করছিল, ঠিক মেহরের ভেজা চোখের মতো।

— “এখন থেকে পালাতে পারবি না,” রায়ান হেসে বলল।

মেহর ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,

— “আমি কই পালাইছিলাম?”

— “মনের ভেতর।”

মেহর আবার কেঁদে ফেলল।
রায়ান আঙুল দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিল।

— “এই চোখে শুধু হাসি মানায়, কান্না না।”

কিন্তু তারা জানত না— দূরে দাঁড়িয়ে ট্রিশা সব দেখেছে।

তার হাত মুঠো হয়ে গেছে।

— “এটা হতে পারে না...” সে ফিসফিস করল।

তার মাথায় একের পর এক প্ল্যান ঘুরছে।

— “বাড়িতে আগে জানাতে হবে...”

তার চোখে এখন স্পষ্ট হিংসা।
ভালোবাসার গল্পে সে হতে চলেছে ঝড়।

গাড়িতে ফেরার সময় দুজনেই চুপ।

কিন্তু সেই চুপে হাজার কথা।

মেহর আস্তে বলল,
— “এখন কী হবে?”

রায়ান স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরল।
— “এখন লড়াই হবে। কিন্তু আমি একা না... তুমি আছো।”

মেহর তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এই প্রথম তার ভয় কম লাগছে।

কারণ এখন সে একা না।

বাড়িতে ঢুকতেই অদ্ভুত নীরবতা।

ড্রইংরুমে বড়রা বসে।

ট্রিশা আগেই সব বলে দিয়েছে—
“রায়ান ভাইয়া একটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়...”

রায়ানের বাবা কঠিন গলায় বললেন,
— “রায়ান, আমাদের সাথে কথা আছে।”

মেহরের বুক কেঁপে উঠল।

রায়ান তার দিকে একবার তাকাল।

চোখে শুধু একটাই কথা— ভয় পেও না।

ঘরে বসে মা বললেন,
— “আমরা তো তোর বিয়ের কথা ভাবছি। তুই অন্য কোথাও জড়িয়েছিস?”

রায়ান কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর ধীরে বলল,
— “হ্যাঁ।”

ঘর একদম নিস্তব্ধ।

— “আমি যাকে পছন্দ করি... তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না।”

মেহর দরজার আড়াল থেকে সব শুনছে।

তার চোখ আবার ভিজে গেছে।

কিন্তু এবার কষ্টে না—
ভালোবাসার নিশ্চিন্ততায়।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,
— “কে সে মেয়ে?”

রায়ান চোখ নামিয়ে বলল,
— “সময় হলে জানাবো। এখন শুধু এটুকু জানেন...
আমি সিরিয়াস।”

তার কণ্ঠে এমন দৃঢ়তা—
যে আর কেউ কথা বাড়ালো না।

দরজার আড়াল থেকে মেহর বুক চেপে ধরল।
সে জানে— তার নাম এখনো উচ্চারিত হয়নি,

তবু আজ সে প্রথমবার নিজেকে কারও “ভবিষ্যৎ” মনে করছেরাতটা অদ্ভুত চুপচাপ।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে।
মেহর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। মনটা ভারী —
রায়ানের পরিবার, বিয়ের চাপ... সব মিলিয়ে ভয় কাজ করছে।

হঠাৎ নিচ থেকে আস্তে গিটারের শব্দ।

মেহর অবাক হয়ে নিচে তাকাল।

বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রায়ান।
হালকা হলুদ লাইট জ্বলছে পাশে।
সে তাকিয়ে আছে শুধু মেহরের দিকেই।

তারপর ধীরে গাইতে শুরু করল—

“বলোনা মনে কি রাখবে
একটু ভালো আমায় বাসবে বলোনা
থেকে কি যাবে পাশে চিরকাল...”

মেহরের চোখ ভিজে উঠল।

রায়ানের গলা খুব জোরে না,
কিন্তু এত গভীর... যেন প্রতিটা শব্দ সরাসরি তার হৃদয়ে গিয়ে লাগছে।

সে আবার বলে উঠলো মেহর কি উদ্দেশ্য করে ,
এবার চোখ বন্ধ করে—

“ভিড়ের মাঝে হাতটা ধরো
হারিয়ে গেলে খুঁজে নিও
আমার পৃথিবী তুমি ছাড়া
অন্য কোথাও বাঁচে নাকো...”

মেহর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে নিচে নেমে এল।

রায়ান গান থামিয়ে তাকাল।
— “তোমার জন্য...”

মেহর কাঁপা গলায় বলল,
— “এভাবে ডাকলে... না এসে পারি?”

রায়ান হালকা হেসে বলল,
— “আমি চাই না তুমি কখনো দূরে দাঁড়িয়ে শোনো... সবসময় পাশে থেকো।”

মেহর তার সামনে এসে দাঁড়াল।
চোখে জল, ঠোঁটে হাসি।

আজ আর কেউ ভালোবাসি বলেনি।সেদিনের পর থেকে মেহর আর রায়ানের মাঝে অদ্ভুত এক স্বচ্ছতা তৈরি হলো।

আগে চোখে চোখ পড়লে লজ্জা ছিল,
এখন সেখানে নরম হাসি।

কিন্তু তারা সাবধান।
বাড়ির কারও সামনে বেশি কথা না, বেশি কাছে না।

রান্নাঘরে একবার হাত ছুঁয়ে গেলে মেহর সরে যায়,
রায়ান শুধু মুচকি হাসে।

তাদের ভালোবাসা এখন শব্দহীন,
তবু আগের চেয়ে অনেক বেশি সত্য।

ট্রিশা ইচ্ছে করে রায়ানের সামনে অন্য এক মেয়ের প্রস্তাবের কথা তোলে।

— “রায়ান ভাইয়া, খালামণির পরিচিত এক আপু নাকি তোমার জন্য পারফেক্ট!”

রায়ান বিরক্ত হয়ে বলে,
— “এই বিষয়ে কথা বলতে চাই না।”

দূরে দাঁড়িয়ে মেহর সব শোনে।
তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ট্রিশা সেটা লক্ষ্য করে মুচকি হাসে।

সে বুঝে গেছে—
মেহরকে কষ্ট দিলে রায়ানও অস্থির হয়।

রাতে ছাদে দেখা।

মেহর নিচু গলায় বলল,
— “তোমার জন্য অনেক প্রস্তাব আসবে... আমি ভয় পাই।”

রায়ান ধীরে বলল,
— “আমার জীবনে একটাই প্রস্তাব জরুরি ছিল। আমি সেটা দিয়েছি।”

সে মেহরের হাতটা আস্তে ধরে।
— “বাকি দুনিয়া অপেক্ষা করতে পারে।”

মেহরের চোখ আবার ভিজে যায়।
কিন্তু এবার তার ভেতরে একধরনের শক্তিও জন্মাচ্ছে।

খালামণি লক্ষ্য করেন—
রায়ান অন্য কারও কথায় আগ্রহী না।

তিনি একদিন আলাদা করে জিজ্ঞেস করলেন,
— “মনে কেউ আছে?”

রায়ান চুপ করে রইল।
তার এই নীরবতাই ছিল উত্তর।

দূর থেকে মেহর দেখছিল।
তার বুক ধড়ফড় করছে।

সবকিছু যেন ধীরে ধীরে প্রকাশের দিকে যাচ্ছে।

বিকেলে ছাদে হালকা বৃষ্টি পড়ছে।

মেহর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টির ফোঁটা হাতে পড়ছে।

রায়ান এসে তার পাশে দাঁড়াল।
কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ।

তারপর রায়ান বলল,

— “ঝড় আসার আগে আকাশ খুব শান্ত থাকে জানো?”

মেহর তাকাল,
— “আমাদের ঝড় আসবে?”

রায়ান মৃদু হাসল,
— “আসবে। কিন্তু ভয় নেই... আমি তোমার পাশে থাকবো।”

বৃষ্টির ফোঁটা মেহরের কপালে পড়ল।
রায়ান হাত বাড়িয়ে মুছে দিল।

দূরে দাঁড়িয়ে ট্রিশা এই দৃশ্য দেখে চলে গেল দ্রুত।

তার চোখে এখন সিদ্ধান্ত—
এই শান্তি সে ভাঙবেই।

আর এদিকে—
দুজন মানুষ, এক ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে,

আসন্ন ঝড়ের আগেই একে অপরকে আঁকড়ে ধরতে শিখছেরায়ান অবশেষে এক রাতে বাবা-মার সামনে বলল—

— “আমি যাকে ভালোবাসি... সে আমাদেরই পরিবারের মেয়ে। মেহর।”

ঘরে নিস্তব্ধতা।

মা অবাক, খালামণি হতভম্ব।
— “এটা কি ঠিক হবে?”
— “আত্মীয়তার সম্পর্ক...”

অনেক প্রশ্ন, অনেক আপত্তি।

দরজার আড়াল থেকে মেহরের হাত কাঁপছিল।

রায়ান দৃঢ় গলায় বলল,
— “আমি ভেবে বলছি। ও ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না।”

পরদিন বাড়ির পরিবেশ ঠান্ডা।

মেহর কারও চোখে চোখ তুলতে পারছে না।
মনে হচ্ছে সব দোষ তার।

ট্রিশা সুযোগ নিয়ে ফিসফিস করে,
— “দেখলে? বলেছিলাম না এত সহজ হবে না...”

কিন্তু রাতে রায়ান মেহরকে বলল,
— “ঝড় মানেই শেষ না। ঝড়ের পর আকাশ পরিষ্কার হয়।”

রায়ানের মা দূর থেকে মেহরকে দেখছিলেন—
চুপচাপ সবার কাজ করছে, চোখে ভদ্রতা, আচরণে সম্মান।

খালামণি ধীরে বললেন,
— “মেয়েটা খারাপ না আপা...”

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,
— “ছেলের সুখটাই বড়...”

ধীরে ধীরে আপত্তির সুর নরম হতে শুরু করল।

এক সন্ধ্যায় বাবা ডেকে বললেন,

— “তোমরা দুজন কি ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছ?”

রায়ান মেহরের দিকে তাকাল।
মেহর মাথা নিচু করেই বলল,
— “জি...”

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

— “তাহলে আমাদেরও রাজি থাকতে হবে।”

মেহরের চোখ ভিজে উঠল।
রায়ান নিঃশ্বাস ছাড়ল— যেন বুকের পাথর নেমে গেল।

ছোট্ট পারিবারিক আয়োজনে আংটি বদল হলো।

সবাই হাসছে, ছবি তুলছে।

রায়ান আস্তে বলল,
— “এবার অফিসিয়ালি পালানোর উপায় নাই।”

মেহর লজ্জায় বলল,
— “আমি তো আগেই ধরা।”

দূরে দাঁড়িয়ে ট্রিশা সব দেখছিল।

তার মুখে জোর করে হাসি, কিন্তু চোখে অদ্ভুত শূন্যতা।

ট্রিশা একা হয়ে পড়ছিল ভিতরে ভিতরে।

তার হিংসা, কষ্ট, অপূর্ণ ভালোবাসা—
সব মিলিয়ে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিল।

একদিন সে নিজেকে আঘাত করার চেষ্টা করে বসে...
কিন্তু সময়মতো বাড়ির লোকজন টের পেয়ে যায়।

তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ডাক্তার বলেন,
— “ও মানসিকভাবে খুব ডিস্টার্বড ছিল। এখন সবচেয়ে দরকার ওর পাশে থাকা।”

মেহর কাঁদতে কাঁদতে বলে,
— “আমরা খেয়াল করতে পারিনি...”

রায়ান চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
ভালোবাসার লড়াইয়ের মাঝে কেউ যে এতটা একা হয়ে গিয়েছিল— তা তারা বুঝতেই পারেনি।

বাড়ি সাজানো আলোয়, ফুলে, আনন্দে।

কিন্তু সবার মনে ট্রিশার জন্য চিন্তা আছে।
সে এখন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে, ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে।

মেহর বিয়ের সাজে আয়নার সামনে বসে।
চোখে জল, ঠোঁটে কাঁপা হাসি।

— “সব ঠিক হবে তো?” সে ফিসফিস করে।

রায়ান এসে ধীরে বলে,
— “আমরা কাউকে হারিয়ে সুখী হবো না। আমরা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবো।”

বিয়ের মণ্ডপে বসে যখন কাজি কবুল বলাতে বলেন —
দুজনেই একসাথে বলে,
— “কবুল।”

চারপাশে তালি, হাসি, কান্না মেশানো আনন্দ।

দুইটা হৃদয়ের ভালোবাসা আজ পরিবারে জায়গা পেল —
কিন্তু তারা শিখল, ভালোবাসার পথে কাউকে একা ফেলে গেলে সে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে।

রায়ান মেহরের কানে আস্তে বলল,
— “এবার থেকে শুধু আমাদের না... চারপাশের সবার মনও দেখবো।”

মেহর মাথা নেড়ে বলল,
— “একসাথে।”

💐💍✨বিয়ের পরের সকাল।

মেহর ঘুম ভাঙতেই বুঝল— এ ঘরটা এখন তারও।

জানালা দিয়ে সকালের আলো ঢুকছে।
সে উঠে বসতেই দেখে রায়ান দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে।

— “এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?” মেহর লজ্জা পেয়ে বলল।

রায়ান মুচকি হেসে বলল,
— “ভাবছি, এতদিন যাকে দূর থেকে দেখতাম... সে আজ আমার ঘরে।”

মেহরের গাল লাল হয়ে গেল।

সে নিচু গলায় বলল,
— “এখনও বিশ্বাস হয় না সব সত্যি...”

রায়ান এগিয়ে এসে বলল,
— “স্বপ্ন না। এবার থেকে প্রতিটা সকাল একসাথে শুরু হবে।”

বিয়ের কিছুদিন পর তারা ট্রিশাকে দেখতে গেল।

সে ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে।
চোখে আগের সেই হিংসা নেই, শুধু ক্লান্তি আর নীরবতা।

মেহর তার পাশে বসে হাত ধরল।
— “আমরা তোমাকে হারাতে চাই না।”

ট্রিশার চোখ ভিজে উঠল।
— “আমি ভুল করেছিলাম... কিন্তু তোমরা আমাকে ফেলে দাওনি।”

রায়ান শান্ত গলায় বলল,
— “পরিবার মানে শুধু সুখ ভাগ করা না, কষ্টেও পাশে থাকা।”

সেদিন তিনজনের মাঝে নতুন এক বোঝাপড়া তৈরি হলো।
ভালোবাসা কারও বিরুদ্ধে না—
ভালোবাসা মানে সবাইকে জায়গা দেওয়া।

এক বছর পর।

বাড়ির ছাদে সবাই মিলে বসেছে।
হাসি, আড্ডা, চা— একদম আগের মতো, কিন্তু সম্পর্কগুলো আরও গভীর।

মেহর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল।
ঠিক যেমন একদিন একা দাঁড়িয়ে ছিল।

পেছন থেকে রায়ান এসে বলল,
— “কী ভাবছো?”

মেহর হাসল,
— “ভাবছি... কত ভয় ছিল, কত কান্না ছিল। তবু শেষমেশ সব ঠিক হয়ে গেল।”

রায়ান তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল,
— “কারণ আমরা পালাইনি। হাত ছেড়ে দিইনি।”

মেহর ধীরে তার হাত ধরল।

— “ভালোবাসা কি জানো?”
— “কি?”
— “যখন ঝড় আসে, তবু কেউ বলে — আমি আছি।”

রায়ান হেসে বলল,
— “আর সেই ‘আমি’ টা এখন ‘আমরা’।”

আকাশে সন্ধ্যার তারা জ্বলছে।
নিচে বাড়ির ভেতর হাসির শব্দ।

যে গল্পটা শুরু হয়েছিল ভুল বোঝাবুঝি, লুকানো অনুভূতি আর অজানা ভয় দিয়ে—
সেটা শেষ হলো বোঝাপড়া, সাহস আর একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ভালোবাসা কখনো সহজ না।
কিন্তু সত্যি হলে —
সে একদিন নিজের আলো নিয়েই ফিরে আসে। ✨💞

🌸 সমাপ্ত 🌸